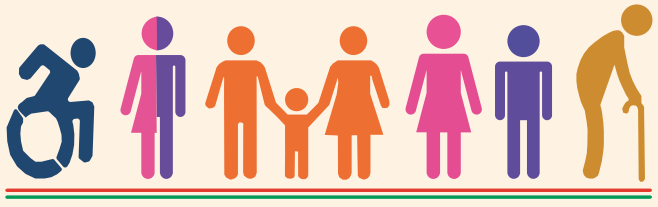

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

মানবাধিকার দিবস ২০১৯

“মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা”

১০ ডিসেম্বর ২০১৯

উপদেষ্টা মন্ডলী

নাছিমা বেগম, GbwWwm, †Pqvig¨vb
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, mve¶wYK m`m¨
তৌফিকা করিম, A‰eZwbK m`m¨
চিংকিউ রোয়াজা, A‰eZwbK m`m¨
মিজানুর রহমান খান, A‰eZwbK m`m¨
জেসমিন আরা বেগম, A‰eZwbK m`m¨
ড. নমিতা হালদার, GbwWwm, A‰eZwbK m`m¨

সম্পাদক

ফারহানা সাঈদ, Rbms‡hvM KgKZv

প্রকাশনায়

RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb
wewUGgwm feb, 7-9 KviIqvb evRvi, XvKv-1215

I‡qemvBUt **www.nhrc.org.bd**
†níjvBbt ১৬১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'মানবাধিকার দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তরুণরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এ প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা" অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসেম্বরের ১০ তারিখে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। আমি নারী, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ ভূয়সি প্রশংসা অর্জন করেছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে বাংলাদেশ ১৭৮টি রাষ্ট্রের ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে যা মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি 'মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় তরুণ সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ বয়সেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। তিনি ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নির্যাতনের মুখে মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তাঁদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তাসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আমরা দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরাই ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময় বাংলাদেশ তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে। আমরা মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রমিকের অধিকার, শিশু, নারী, প্রতিবন্ধীর অধিকারসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছি। এ সকল কনভেনশন কার্যকর করার লক্ষ্যে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষা, সমধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে।

আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ বছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য হল, 'Youth Standing Up for Human Rights'; বাংলায় "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখতে তারুণ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তরুণরাই প্রথম সোচ্চার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও তরুণরা অসামান্য অবদান রেখেছিল।

মানবাধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে সেই অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী কোনো নাগরিককে তার আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আমি মনে করি, নারী ও শিশুসহ সকলের অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরো সোচ্চার যেমন হতে হবে তেমন মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতাও বাড়াতে হবে। সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশ লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়েছে। সমতা, ন্যায়বিচার এবং মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশ এসডিজি অর্জনেও একই রকম সাফল্য দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে।

আমি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষত তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি

আনিসুল হক, এমপি
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা" - এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। এ মহান দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মা-বোনের নির্যাতনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই মূলনীতি বাস্তবায়নে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ সহ বড়বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ তিন তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেছে। মিয়ানমারে মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছেন এবং মানবিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

বর্তমানে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সব ধরণের সন্ত্রাস মোকাবেলায় কাজ করছে সরকার। পাশাপাশি মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় ও আদেশ দ্রুত কার্যকর করার যথাযথ পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে সরকারের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। বাংলাদেশে যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাদেরকেই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে।

আমি মনে করি, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা সকলের দায়িত্ব। তাই মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, আইনজীবী, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সারাবিশ্বে মানবাধিকার সুসংহত এবং সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তুরুণদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই শোষণ-বঞ্চনামুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা এবং সুপ্রতিষ্ঠার এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হবে। আমার আহ্বান তরুণরা যেন এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

০৭/১২/২০১৯

(আনিসুল হক,এম.পি)

নাছিমা বেগম, এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

evYx

gvbevwaKvi †`‡ki mxgv‡iLv w`‡q mxgve× bq| G AwaKvi gvb‡li Rb¥MZ hv †KD †K‡o wb‡Z cv‡i bv| gvbevwaKvi mi¶v I Dbœq‡b 1948 mv‡ji 10 wW‡m¤^i RvwZmsN KZ…K gvbevwaKv‡ii mveRbxb †NvlYvcÎ MnxZ nq| †m †_‡K cÖwZeQi 10 wW‡m¤^i gvbevwaKvi w`em cvwjZ nq| G w`em cvjbU gvb‡li ghv©`vi mv‡_ †e‡P _vKvi Rb¨ m‡PZbZv e„×‡Z †hgb ¸i“ZcY, †Zgwb Avb‡›`i| RvZxq gvbevwaKvi Kwgk‡bi c¶ †_‡K Avwg mKj‡K RvbvB AvšÍwiK ï‡f”Qv|

meKv‡ji me‡kô evOvjx Avgv‡`i RvwZi wcZv gvbevwaKvi cwZôv I mi¶vq wbijm KvR K‡i †M‡Qb| Zvi †bZ‡ZB Avgv‡`i msweav‡b mKj bvMwi‡Ki Rb¨ AvB‡bi kvmb, †gŠwjK gvbevwaKvi Ges ivR‰bwZK, A_©‰bwZK I mvgvwRK mvg¨, ¯vaxbZv I mwePvi wbwðZKi‡Yi A½xKvi i‡q‡Q hv mveRbxb gvbevwaKv‡ii †NvlYvc‡Îi m‡½ c‡ivcwi m½wZcY|

ÒgvbevwaKvi mi¶vq Zvi“‡Y¨i AwfhvÎvÓ- G cwZcv`¨‡K mvg‡b †i‡L Kwgkb †_‡K Av‡qvwRZ Gev‡ii Abôv‡b gvbbxq cavbgš¿x, cavb AwZw_i Avmb AjsKZ Kivq w`em cvj‡b bZb D`¨‡gi mÂvi n‡q‡Q| ZYgj †_‡K †K›`ª chš— gvbevwaKvi m¤ú‡K m‡PZbZv e„×i j‡¶¨ eYvX¨ i¨vwj, Av‡jvPbv mfv I †mwgbv‡ii Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| we‡kl K‡i Zi“Y cRb¥‡K w`e‡mi bvbv Av‡qvR‡bi m‡½ m¤ú³ K‡i gvbevwaKv‡ii ms¯‥wZi PPv‡K †eMevb Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q|

gvbevwaKvi cwZôvi gj `kb‡K aviY K‡i gvbevwaKvi Kwgkb GwM‡q hv‡”Q| G j‡¶¨ be wbh³ Kwgkb †ek wKQ c`‡¶c MnY K‡i‡Q| Kwgk‡bi Kvhµg‡K AviI MwZkxj Kivi Rb¨ B-dvBwjs Pvj Kivi j‡¶¨ Kwgk‡bi KgKZv‡`i cwk¶Y †`qv n‡q‡Q| `“Z I mn‡R Awf‡hvM wb®úwËi j‡¶¨ AbjvBb Awf‡hvM e¨e¯vcbv KvhKi Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| we‡kl Ab¨vb¨ †`‡ki m‡½ Zvj wgwj‡q Kwgk‡bi Kvhµg‡K AviI h‡Mvc‡hvMx Ges G ¯vaxb cwZôv‡bi Kvhµ‡g ¯KxqZv Avbq‡bi Rb¨ Kwgk‡bi GKwU wbR¯ feb wbgvY AZ¨š— Ri“wi weavq Kwgkb †_‡K miKv‡ii `wó AvKlY Kiv n‡q‡Q|

B‡Zvg‡a¨ gvbevwaKvi mi¶vq evsjv‡`‡ki MnxZ †ek wKQ Kvhµg AvšRwZK cwigÊ‡j cksmZ n‡q‡Q| wgqvbgv‡ii wbhvwZZ n‡q cwj‡q Avmv †ivwn½v‡`i Avkq †`Iqvi cvkvcvwk msKU †gvKv‡ejvq `i`kx †bZZ I gvbweKZvi Rb¨ gvbbxq cavbgš¿x †kL nvwmbv gvbeZvi Rbbx †LZv‡e fwlZ n‡q‡Qb| †c‡q‡Qb AvBwcGm B›Uvib¨vkbvj GwPf‡g›U GIqvW I 2018 †¯úkvj wWmwUskb GIqvW di wjWviwkc|

gvbbxq cavbgš¿x †kL nvwmbvi h‡Mvc‡hvMx AmvaviY †bZ‡Z bvixi ¶gZvq‡b evsjv‡`k AvR we‡k †ivj g‡Wj| GKBfv‡e ivó cwiPvjbvq Zvi gvbweK ¸Yvewji cwZdjb i‡q‡Q| Avgiv Avkv Kwi Zvi m‡hvM¨ †bZ‡Z evsjv‡`k GKwU gvbweK ivó wn‡m‡eI we‡ki e‡K †ivj g‡Wj wn‡m‡e gv_v DP K‡i `vov‡e|

gvbevwaKvi mi¶vq Zvi“‡Y¨i Awfhvîv wbwðZ Kivi gva¨‡g Avgiv Avgv‡`i KvwOÿZ ¯‡ci evsjv‡`k M‡o Zje| wek gvbevwaKvi w`e‡m GB †nvK Avgv‡`i mw¤§wjZ A½xKvi|

নাছিমা বেগম, এনডিসি

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
সার্বক্ষণিক সদস্য

মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে তরুণরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বের প্রতিটি দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণদের অবদান অনস্বীকার্য। মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রেও তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাই, আমি মনে করি, মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পথ চলার এক দশক পূর্ণ হল। অর্থাৎ, বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষার এক দশক। ফলে, ২০১৯ সাল আমাদের জন্যে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের জীবন, অধিকার, সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাগুলিই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। অধিকারগুলি কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ও কেন

মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার ও আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। দেশে দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬৭টি রাষ্ট্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ দ্বারা ২০১০ সালের ২২ জুন মাসে একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং পাঁচজন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ- বাংলাদেশ যার পক্ষভুক্ত, ইত্যাদি দলিলপত্রে এই এখতিয়ার সংরক্ষিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা-১২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতাবলে যে কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (suo moto) অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে;
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সে সবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় স্বীকৃত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের ওপর গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

- প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোন অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
- মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/সেবাপ্রার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্যধারায় প্রয়োজনে পক্ষ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা ভুক্তভোগীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।
- তদন্ত প্রতিবেদনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অথবা স্বয়ং রিট করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন বয়সের দেশী বা বিদেশী যে কোন ব্যক্তি কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রামের বা শহরের, সমতলের বা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ধনী, গরীব, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যে কেউ কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ করতে পারেন। অবস্থা বিবেচনায় কমিশন স্ব-উদ্যোগেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে যে অধিকারগুলি সকল নাগরিককে দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন হলে বা লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হলে বা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বর্ণিত অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়। কেউ যদি মনে করেন যে, মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে তাঁর জীবন, সমতা ও মর্যাদার যে অধিকার পাওনা আছে তা ক্ষুন্ন হয়েছে কিংবা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোন জনসেবক বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মানবাধিকার (জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদাসংক্রান্ত অধিকার) লঙ্ঘন করা হয়েছে বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বা এই সব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা হয়েছে তাহলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়।

কমিশনের নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে, কমিশনের অফিসে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক মারফত, ফ্যাক্স অথবা ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো যায়। অভিযোগের সাথে অন্যান্য কাগজপত্র, ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়ারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য ভিজিট করুনঃ **www.complaint.nhrc.org.bd.** এরপর পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

(১) অভিযোগ গ্রহণ করার পর কমিশনের বাছাই সেল অভিযোগটির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখবে;

(২) বাছাই সেল যদি দেখে যে আবেদনটি কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে তাহলে অভিযোগকারীর কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শসহ পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে অভিযোগকারীর ঠিকানায় লিখিত উত্তর পাঠাবে;

(৩) অভিযোগটি কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে হলে কমিশন অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে;

(৪) তদন্তে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় প্রকাশ পায় তাহলে কমিশন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধটি মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে;

(৫) মধ্যস্থতা সফল না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোন কার্যধারা দায়ের করার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।

মনে রাখবেন অভিযোগ করা বা অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, অভিযোগ করার আগে পরামর্শ করা ইত্যাদির জন্য অভিযোগ দায়ের থেকে নিষ্পত্তির কোন পর্যায়েই কোনো আর্থিক লেনদেন/খরচ করার প্রয়োজন হয় না।

মিজানুর রহমান খান
A\eZ\bK m`m¨

মানবাধিকার রক্ষায় লিগ্যাল এইডের ভূমিকা

আইনের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমেই মানুষ তার মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার, জাতীয়তা, বাসস্থান, লিঙ্গ, জাতীয় বা নৃতাত্ত্বিক উৎস, রঙ, ধর্ম, ভাষা বা অন্য যেকোন মর্যাদাই হোক না কেন এই প্রত্যেকটি বিষয় মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। প্রত্যেক মানুষ তার মানবাধিকার রক্ষায় সমান অধিকারী। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। ঘোষণাপত্রের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই আইনগত নিরাপত্তা লাভের সমান অধিকারী"। কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই এ ঘোষণা ভঙ্গ এবং সেরকম বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকলেরই সমান নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

সার্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুক্তি, প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন, সাধারণ নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎসসমূহ প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজ দেশের আইন দ্বারা প্রকাশের মাধ্যমে নিশ্চিত করে। এরই অন্যতম উদাহরণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে"। সুতরাং সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের সেই দায়বদ্ধতা থেকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী "মানবাধিকার অর্থ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার।"

নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থের অভাবে কেউ যদি তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা আইনের আশ্রয় না পায় তবে তার অন্য সব মৌলিক চাহিদাগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার হলো অন্যান্য মৌলিক চাহিদার সম্পূরক একটি অধিকার। বিচার ও দন্ড সম্পর্কে সংবিধানের ৩৫(৩) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন। এই মানবাধিকার রক্ষায় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো- মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্য ধারায় প্রয়োজনে পক্ষ হয়ে প্রতিদন্দ্বীতা করা বা ভুক্তভোগীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা। আইনগত সহায়তা সামাজিক ন্যায়-বিচারের পথকে সুগম করে দেয়।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে নিয়েই এই রাষ্ট্র। আর্থিক বৈষম্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে তার আইনগত অধিকার রক্ষায় আদালতের দারস্থ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া সমাজের অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পক্ষেও প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় অধিকার আদায়ে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থী জনগণের আইনগত অধিকার রক্ষায় লিগ্যাল এইড বা আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকার রক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০"। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আইনগত সহায়তা পাওয়া দরিদ্র মানুষের অধিকার। এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় ও বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সরকার সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে "লিগ্যাল এইড অফিসার" হিসেবে পদায়ন করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচার প্রার্থী ও শ্রমজীবী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সরকারের এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখন অসহায়, অস্বচ্ছল ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে অসমর্থ বিচার প্রার্থী সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষ তাদের আইনগত অধিকার রক্ষা করতে পারছে। লিগ্যাল এইড অফিস থেকে তারা আইনি পরামর্শ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এবং মামলা দায়ের করতে সরকারি খরচে যাবতীয় সহযোগিতা পাচ্ছে।

লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের এযাবৎ কালের তথ্য-পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা	হটলাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	৫৯৬৩১	২৫৩৭৮৯	২৪৬৪১	১৭৩২৮	৩৫৫৩৮৯	২৩,৯৫,৪০,০৩৪/-
সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৭০৬৪	২৫২২			১৯৫৮৬	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি- "১৬৪৩০")	৭৬৩৯১				৭৬৩৯১	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৩০০২	২৭০৬	১৮৪৮		১৭৫৫৬	২,৯৮,৭৬,৮৪৯/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					৪,৬৮,৯২২ (চারলক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শত বাইশ জন)	২৬,৯৪,১৬,৮৮৩/- (ছাব্বিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ষোল হাজার আটশত তিরাশি) টাকা

উৎস: ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পরিসংখ্যান, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইনগত সহায়তা ছাড়া স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় নিজেদের মানবাধিকার রক্ষা করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা সরকারের দান বা বদান্যতা নয়। এটি নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। বর্তমান সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী বলেই জনগণের এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অস্বচ্ছল ও দরিদ্র মানুষকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সরকার অসহায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে তার আইনগত অধিকার সুরক্ষায় "বিচার প্রবেশাধিকার" নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে। এভাবেই মানবাধিকার রক্ষায় লিগ্যাল এইড "আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার" এই সাংবিধানিক অধিকারকে সুরক্ষিত করছে।

জেসমিন আরা বেগম
A‰eZ‰bK m`m¨

মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা

মানবাধিকার কথাটির শাব্দিক অর্থ সকলের জানা। কারণ শব্দটির মধ্যে তার অর্থ নিহিত। মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বের কাছে মানুষের যে অধিকার জন্মায় তাই মানবাধিকার। কী সেই অধিকার?

- বেঁচে থাকার অধিকার
- খাদ্যের অধিকার
- কথা বলার অধিকার
- বাসস্থানের অধিকার
- কর্ম লাভের অধিকার
- অন্য মানুষের সঙ্গে বাস করার জন্য সমান অধিকার
- সম্পত্তির অধিকার

অর্থাৎ একজন মানুষকে মানব হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যা যা আবশ্যকীয় তার প্রাপ্যতার অধিকার।

এই অধিকার সে কোথা থেকে পাবে? কে তাকে দিবে এই অধিকার? দেবে পরিবার, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বোপরি এই বিশ্ব, সারা পৃথিবী। সারা পৃথিবীর কাছে পৃথিবীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন মানবের তা প্রাপ্যতা হয়ে যায়।

এই প্রাপ্যতার বিষয়টি দিতে কেউ কি অস্বীকার করে? না!--সবাই স্বীকার করে নেয়, হ্যাঁ মানবের এই অধিকার প্রাপ্য। তথাপি পরিবার, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব প্রত্যেক মানবকে তা দিতে সক্ষম হয় না। মানুষ জন্মগতভাবে সবল/দুর্বল/প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মায়। এছাড়াও ধনী/দরিদ্র, ব্রাহ্মণ/শুদ্র একেক জন মানুষ একেক রকম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমাজে, গোত্রে, পরিবারে, সকল মানুষ সমান অধিকার প্রাপ্ত হয় না। এই সমান অধিকার প্রাপ্তির জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, যুগে যুগে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে মানবের মানবিক অধিকার প্রদানের জন্য তরুণ সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর এবারের স্লোগান মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা।

'Survival of the Fittest' (যোগ্যতম ব্যক্তি টিকে থাকে) ডারউইউনের এই বক্তব্য শাশ্বত সত্য। প্রাচীনকাল থেকে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার পরিবারে/গোত্রে/সমাজে, প্রমাণিত হয়েছে যে, শক্তির কাছে দুর্বল সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত, সবল সকল সময় দুর্বলের অধিকার কেড়ে নেয়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার নিরসনকল্পে প্রথমে মানুষ গোত্র সৃষ্টি করে, সমাজ সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র সৃষ্টি করে, অন্যের অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন তৈরি করে কিন্তু তথাপি মানুষে মানুষে বৈষম্য সবলের দ্বারা দুর্বলের নির্যাতন/জাত/পাত/ধর্ম/বর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের নির্যাতনের ইতিহাস একেক দেশে একেক রকম। কারণ একেক দেশে মানুষের মনন একেক রকম। কেউ মনিব, কেউ দাস, কেউ দলিত, কেউ পতিত, কেউ পঙ্গু, কেউ তৃতীয় লিঙ্গ। নানান ধরনের মানুষ জর্জরিত নানান রকমের অত্যাচারে। পরিবার, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না। তখন বিশ্ব রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। UN তৈরি হয়, হিউম্যান রাইটস অরগানাইজেশন তৈরি হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় ব্যস্ত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস তারুণ্যের গৌরব গাঁথার ইতিহাস। মানবের অধিকার সুরক্ষায় তরুণরা এগিয়ে এসেছে সর্ব যুগে সর্ব কালে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙ্গালীরা পাকিস্তানিদের কাছে নিম্নবর্ণের মানুষ ছিল। তাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সমুদয় বিষয় যখন পাকিস্তানি প্রভুদের দ্বারা নিষ্পেষিত হওয়ার উপক্রম। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে যে তরুণটি সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন, মাতৃভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেছিলেন সেই তরুণের হাত ধরে ছয় দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, এবং একাত্তরের তরুণদের নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে সাহসী তরুণদের শৌর্য বীর্য রক্তে বাংলাদেশের সৃষ্টি। যার নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ নেতা জাতির জনক। সেই অকুতোভয় নেতা, জাতির পিতার ডাকে কোটি কোটি তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে, সে রাষ্ট্রের জাতির পিতা ৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় মানবের অধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭-৪৪ ধারা মানবাধিকার রক্ষা কবচ হিসাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন এবং তা প্রয়োগের প্রচেষ্টা নেন। তার সুযোগ্য কন্যা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সঠিকভাবে সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে কি-না সুপারভিশন করার জন্য ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। মানবাধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ মনোনিবেশ করেন। তৈরি করেন মানবিক অধিকার রক্ষার সকল আইন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, শিশুশ্রম নিরোধ আইন, আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, যা শ্রমজিবী শিশুকে, দুস্থ মানুষকে আইনগত সহায়তা প্রদান করে বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করে।

আমাদের সংবিধানের পরতে পরতে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সকল প্রকার আইন থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে, সমাজে, বিভিন্ন স্তরে নিরীহ নির্যাতিত মানুষের জীবন উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক ইউনিট, সামাজিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সকল স্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। এমনকি বিশ্বে ইউএন-এর সুবিখ্যাত 'মেগনাকাটা' থাকা সত্ত্বেও বিশ্বমানব দেশে-দেশে বিভিন্নভাবে ধুঁকছে বিভিন্ন ধরণের অবর্ণনীয় নির্যাতনে। তার কারণ কি?

প্রাচীনকাল থেকে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, মানুষ হয়ে মানুষকে কেনা-বেচা, নারীর উপর অপরিসীম নির্যাতন চলে আসছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম এই অনাচার অবিচার দূরীভূত করার জন্য নাজিল হয়েছে। কিন্তু তথাপি অত্যাচারীদের হিংস্র থাবায় ভুলুণ্ঠিত হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। 'মানুষই-- মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু'। দার্শনিক হবস তার মানব চরিত্র রচনা করেন এভাবে যে,'মানুষ হিংস্র, লোভী, স্বার্থপর, কুৎসিত।' মানুষের এই কুৎসিত চেহারাকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আর্দশ রাষ্ট্র, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব তরুণরাই এই বিশ্ববাসীকে প্রদান করেন। মানুষের চরিত্রের মধ্যে এই কুৎসিত দিক যেমন আছে তেমনি 'সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ।' মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করে! মানুষের মধ্যে ইবলিশ বাস করে! এই ইবলিশকে দমন করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে জাগ্রত করার জন্য যুগে যুগে মানবের সেবায় মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন তরুণ। সক্রেটিস গ্রীসের রাজপথে তরুণ সঙ্গীসাথিদের নিয়ে 'ল্যাইসিয়াম' তৈরি করেছিলেন যেখানে মানব সেবার কথা, আত্মসুদ্ধির কথা বলেছেন তার উত্তরসুরী দার্শনিকগণ, একই ভাবে মানুষের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন মত দিয়েছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তরুণ বয়সে সৃষ্টি করেছিলেন 'হিলফুল ফুজুল'। যার অর্থ শান্তি সংঘ। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, দুস্থদের সেবা দান, গোত্রে গোত্রে রক্তারক্তি বন্ধ, সকল মানুষের মধ্যে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। নবুয়্যত প্রাপ্তির পরও পরাজিত পক্ষকে ক্ষমার অমিয় বাণী শুনিয়ে, পরাজিত শক্তির প্রতি সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ দেখিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রচেষ্টায়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশীর্ষ স্থান দখল করেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল কথা এক। মানবের সেবায় আল্লাহ/ঈশ্বর/গডকে পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, সকল ধর্মের মূল কথা মানব সেবা। সকল ধর্ম বিষয়টি স্বীকার করে। কিন্তু ধর্মানুরাগীরা তা প্রদানে কার্পণ্য করে। পরিবার করে, সমাজ করে, রাষ্ট্র করে, এমনকি বিশ্বও এ অধিকার প্রদানে সর্বশক্তি নিয়োগ করে না, বা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সকলকে সমান অধিকার বা মানবাধিকার দিতে সক্ষম হয় না। জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও দেশে-দেশে, ঘরে-বাহিরে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণভেদে, মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা, অসংখ্য এনজিওদের কার্যক্রম, তা রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। অত্যাচারিত মানুষের কান্নার রোল, বর্ণবাদে পিষ্ঠ মানুষের হাহাকার, জাতপাতে ক্লিষ্ঠ মানুষের মানবেতর জীবন, নারীর নির্যাতনের স্টিমরোল, সারা বিশ্বে মানবিক মানুষকে আজও কাঁদায়, ভাবায়, মানুষের মননকে দলিত মথিত করে। কান পাতলে মানবতার হাহাকার শোনা যায়।

মানবাধিকার সুরক্ষার এই উপমহাদেশে গত এক শতকে যেসব তরুণ নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, যারা তরুণ বয়সে শুরু করেছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সহমরণ প্রথার বিলুপ্তিকরণ, বাল্য বিবাহ থেকে নারীকে রক্ষার আন্দোলন, জাতপাতের বিভেদ লঙ্ঘনের ব্রত। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ-সহ শত শত তরুণ কুসংস্কার আচ্ছাদিত ধর্মীয় বন্ধন থেকে মানবের সেবায় এগিয়ে আসেন। জাত-পাত, বর্ণভেদ দূরীভূত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। মানবের সেবায় তরুণী নিবেদিতা নিজ দেশ ছেড়ে জীবন উৎসর্গ করেন। তরুণী মাদার তেরেসা জরা পীড়িত মানুষকে সেবা করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে যান। আমারা পাই মাদার তেরেসা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি তরুণ নেতা শেখ মুজিব স্কুল জীবন থেকে দুস্থ পীড়িতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। নিজের গায়ের চাদর বিলিয়ে দিয়ে শীতার্ত মানবকে রক্ষা করেছেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তরুণ মুজিব হিন্দু-মুসলমানের নিকৃষ্টতম দাঙ্গা দমনে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন। এই তরুণের হাত দিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি। তার সুযোগ্য কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ বৎসরের তরুণ বয়সে সকলকে হারিয়ে জগদ্দল পাথরের মত শোক-কে শক্তিতে পরিণত করে ১৯৮১ সালে এই নির্যাতিত বাংলার মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন বাজি রেখে তারুণ্য নিয়ে যে যুদ্ধে নেমেছিলেন সে যুদ্ধ এখনো চলমান। উন্নয়শীল দেশ রচনায় তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ তেমনি মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। প্রবল সমস্যা সংকুল এই বাংলাদেশে কেবলমাত্র মানবতার খাতিরে মিয়ানমার সামরিক জানতার দ্বারা নির্যাতিত ভুলুণ্ঠিত রোহিঙ্গাদের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করার জন্য লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ঠাঁই দিয়েছেন। বিশ্ববাসী তাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খেতাবে ভূষিত করেছেন। বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘের শুধু এই কারণে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখা উচিত। দেখা যায় যে, তারণ্যের অগ্রযাত্রায় প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তা নিরসনের জন্য তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি স্কুলের রোভার স্কাউট গার্লস-গাইড মানব সেবায় কাজ করছে। বিভিন্ন এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাবে মানব সেবায় কাজ করছে। প্রশাসনিক ইউনিট বিভিন্নভাবে মানুষকে সেবা দেওয়ার কাজে লিপ্ত আছে। তথাপি প্রতিদিনই রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার সংবাদ আমাদেরকে ব্যাথিত করে।

তা নিরসনের জন্য তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে যুগে যুগে তাদের পূর্বসূরী তরুণদের মানবাধিকার রক্ষায় নিজ জীবন উৎসর্গ করে অমর হওয়ার গল্পগাঁথা। 'হিলফুল ফুজুলের' শান্তির বাণী, সক্রেটিস থেকে শুরু করে সকল দার্শনিকদের মতামতসমূহ, মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে হাজার বছর টিকে থাকার গল্প তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। যার দ্বারা তরুণদের মনন সৃষ্টি হবে। ইসলামের শান্তির বাণী, সর্ব ধর্ম দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' জাতীয় শাশ্বত সত্য, দার্শনিক জ্ঞান দ্বারা আমাদের তরুণরা উদ্দীপ্ত হোক। দিকে দিকে তরুণরা মানব সেবার ধ্বজা তুলে নিক হাতে। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, মাদক নয়, অস্ত্র নয়, মহামানবদের জীবনি আমাদের শিশু থেকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। মানবাধিকার সুরক্ষায় পূর্বসূরীদের জীবন দর্শন হোক তারুণ্যের পাথেয়।

ড. নমিতা হালদার
A\eZ\bK m`m¨

বাংলাদেশের সংবিধান এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

অনগ্রসর শব্দের সমার্থক হিসাবে পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত শব্দগুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে অধিকার বঞ্চনাজনিত ঘটনার শিকার হন পিছিয়ে পড়া মানুষেরা। অন্যভাবে বলা যায় অধিকার বঞ্চিত বলেই তারা পিছিয়ে পড়েন এবং মেনে নিতে বাধ্য হন যে কিছু কিছু অধিকার তাদের প্রাপ্য নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়। বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবিকা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদেরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানবাধিকারের অঙ্গীকার বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনাতে রয়েছে এভাবে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। শোষণ মুক্তির বিষয়ে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি শিরোনামে সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগনের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" সত্যিকার অর্থে মুক্তি দান একটি আমূল সংস্কারমূলক বিষয়। তবে উপযুক্ত মজুরী এবং সার ও বীজে ভর্তুকী দিয়ে সরকার কৃষক ও শ্রমিকের যে স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে তা উদাহরণযোগ্য। পক্ষান্তরে, কৃষি শ্রমে নারী পুরুষে মজুরী বৈষম্য, কৃষকের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে না পারা, উপযুক্ত উৎপাদন খরচ না পাওয়া বিষয়গুলি আমলে নিলে শোষণের মাত্রা কমে আসবে।

সুযোগের সমতা বিষয়ে সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে: ১৯(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন; ১৯(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ১৯(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। উল্লেখ্য, নাগরিক ভেদে সুযোগের সমতা অর্জিত হলে পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর শব্দসমূহ হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেত। সম্পদের সুষম বন্টন হলে দেশে ধনী গরীবের ব্যবধান এত বৃদ্ধি পেত না। দেশের উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এত পিছিয়ে কেন? উন্নয়ন বরাদ্দে বৈষম্যের অভিযোগ অতিক্রম করে সমতা আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। ১৯(৩) এ নারীর ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান হলেও নারী-পুরুষের সমতা অর্জন এখনও অনেক দূর।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিশেষ স্বাতন্ত্র রয়েছে ভাষায়, খাদ্যে এবং জীবনাচারে। পাহাড় সমতল ভেদে তাদের রয়েছে বৈচিত্রময় সংস্কৃতি চর্চা। এ বিষয়ক ২৩(ক) অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যেমন "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" ইতিমধ্যে সরকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে তাদের সংস্কৃতি বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলির অন্যতম একটি হলো অনুচ্ছেদ ২৮। এটির মূল বক্তব্য, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য করা যাবে না। ধর্ম, বর্ণ, নারী-পরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন জনগোষ্ঠীকে শর্তাধীন করা যাবে না এবং কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না। তবে ২৮(৪) অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" অনুচ্ছেদটির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার পর নারীদের জন্য চাকুরীতে এবং পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে কোটা সংরক্ষণ। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য চাকুরীতে কোটা প্রবর্তণ এ অনুচ্ছেদেরই অবদান। তবে পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২২ বছরেও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে পাহাড়িদের। উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্তানদের কোন কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না দেয়া, হোটেল রেস্তোরাঁয় বসতে না দেয়ার মত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়। দেশের দলিত সম্প্রদায় তাদের মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাবিত বৈষম্য বিলোপ আইন পাশের দাবীতে সভা সমাবেশ করে যাচ্ছে।

কালের প্রবাহে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনন্য বৈশিষ্টের কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এদের মধ্যে হিজড়া সম্বোধনের মানুষেরা পেয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি। জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য সরকার নির্মাণ করেছে আধুনিক এ্যাপার্টমেন্ট। ধাঙর নামে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীর অভিযোগ তাদের জন্য সংরক্ষিত ৮০% কোটা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়।

মানুষে-মানুষে সমতা, নারী-পুরুষে সমতা, প্রজাতন্ত্রের সুষম উন্নয়ন এসবই সংবিধান স্বীকৃত মানবাধিকার। প্রয়োজনে বিশেষ বিধান করে পিছিয়ে পড়া, সুবিধা বঞ্চিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে এই অধিকার দেয়ার এখনই সময়।

হিরন্ময় বাড়ৈ
অতিরিক্ত সচিব (পি আর এল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রাক্তণ সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাংলাদেশে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ও মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথা অনেক। বাংলাদেশ এখন এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। বর্তমান সরকার অর্থনীতির বিভিন সেক্টরেই অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, বিদ্যুৎ, ভৌত-কাঠামো উন্নয়ন, তৈরী পোশাক, শিক্ষা, আইনের শাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, গত প্রায় এক দশক ধরেই দেশের অভ্যন্তরে এক চমৎকার স্থায়ী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সরকার সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় সরকার চরম ধৈর্য্য ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "মানবতার জননী" অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। তিনি এখন আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি উপভোগ করছেন এবং দেশের মর্যাদা দারুণভাবে সমুন্নত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সরকারের অসংখ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ভিশন ২০২১, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দশ বা ততোধিক মেগা-প্রকল্প এগুলো দেশকে উন্নয়নের এক মহাসড়কে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া, বৈশ্বিক এজেন্ডা এসডিজি দেশের মানুষের জন্য এক নতুন সুযোগের ধারাপাত রচনা করেছে। এর ১৭ লক্ষ্য ও ১৬৯ উদ্দেশ্য আমাদেরকে প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মানবিক ও সাংস্কৃতিক পরিপূর্ণতার দিকেই পরিচালিত করতে পারে। সুতরাং, এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরী এবং উন্নয়নকে টেকসই করার ক্ষেত্রে এখনও প্রচুর প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। কারণ, বিশ্বব্যাপী অনুসৃত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এটা কমবেশী আহরণধর্মী ও বেশ খানিকটা শোষণকারী। ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্পোরেট দুনিয়ার প্রাথমিক চেতনাই হচ্ছে লাভ এবং প্রাপ্তি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবন মানের উৎকর্ষ সাধন প্রতিটি দেশ, জাতি এবং ব্যক্তির একান্ত কামনা। কিন্তু, উন্নয়ন ধারার নিজস্ব কিছু বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। উন্নয়ন প্রায়শই সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। অধিকন্তু, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক মানবিক মূল্যবোধ, ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রজাতি এবং সৃষ্টি হচ্ছে কিছু কিছু অন্ধ ও নির্দয় প্রতিযোগিতার যার সাথে সকল মানুষ সমান তালে চলতে পারছে না। উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে কিছু মানুষ বিভিন্ন অজানা ফাঁদ এবং অচেনা ফাটলে পড়ে যাচ্ছে, নিত্য নতুন কিছু "পিছিয়ে পড়া" মানুষের দল সৃষ্টি হচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঐ সকল মানুষের হয়ে কাজ করছে যারা ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ছে, পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছে, অধঃপতিত হয়ে গেছে বা বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে নিপতিত রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি যাতে শুধুমাত্র ধনীকেই আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র না করে, গিনি কোইফিশিয়েন্ট যাতে ক্রমান্বয়ে আরও বেড়ে না যায় তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে সেটাই মানবাধিকার বিষয়ক প্রশ্ন। উন্নয়নের পাশাপাশি সুষম ও ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করে কিভাবে উন্নয়নকে অন্তর্ভূক্তিমূলক করা যাবে তাই নিয়ে আরও ভাবতে হবে। উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং টেকসই করা প্রয়োজন।

সরকারের অবশ্যই অনেকগুলো যুতসই হাতিয়ার রয়েছে, যেমন- কৌশলগত পরিকল্পনা, সামাজিক নিরাপত্তা জাল, সিটিজেন চার্টার, তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, হেল্প ডেস্ক, ওয়ানস্টপ সার্ভিস ইত্যাদি। সরকার একধরণের বিচক্ষণ ও জনবান্ধব নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেছে যেটি ডিজিটালাইজেশন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং আমলাতন্ত্রের দক্ষতা উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন জোরদারকরণ দ্বারা সমর্থিত। সেবার মান উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের ইতিবাচক মনোভাবেরই পরিচায়ক যাতে মানবাধিকার-বান্ধব পরিসর সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকদের অভিযোগ-অনুযোগ রেজিষ্টারভূক্ত করা হয় বা শোনা হয়। এসডিজির লক্ষ্যসমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ সিস্টেমের কাঠামোয় আবদ্ধ করে সরকার সুকৌশলে দায়বদ্ধতাকে আরও সুস্পষ্ট ও বিমুর্ত করার প্রয়াস পেয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের আরদ্ধ কাজের ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে।

কিন্তু তার পরেও অসাম্য-জনিত সমস্যাসমূহ ও বৈষম্যমূলক আচরণ নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু, পশ্চাৎপদ অঞ্চল, জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ইস্যুগুলো, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের বা রুপান্তরিত লিঙ্গের মানুষ, নারী ও শিশুর অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, অবৈধ পন্থায় দেশান্তর ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান, বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, শ্রম-অধিকার-বঞ্চনা ইত্যাদি যে যে ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘিত হয় সেগুলোর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা জাল কেন সামগ্রিক নিরাপত্তা তৈরী করতে পারছে না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। সমাজে কেন এত ফাঁটল এবং মানুষের মনে কেন এত চির ধরছে। বস্তিবাসীরা কেমন জীবন কাটাচ্ছে। কেন ঢাকা শহরের কিছু অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশী বাসযোগ্য।

বিশ্বায়ন-এর সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে হবে। দূষণকারীদের শাস্তি দিতে হবে। কালো টাকার দাপট যেন না থাকে। ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতির ধারক-বাহক নব্য ধনী ব্যক্তিবর্গ প্রায়শ:ই ব্যস্ত থাকেন জনগণের সম্পদ হাতানোর কাজে। পণ্য পাচার ও আন্তঃসীমান্ত চোরা কারবার থামানো যাচ্ছে না কারণ ক্ষমতাশালীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গই এর সাথে জড়িত থাকছে। এগুলো থামাতে হবে। যারা আইন নিয়ে কাজ করছে তারাই আবার আইন ভঙ্গের কারণ হয়ে পড়ছে। সংস্কৃতিগত সমস্যাও রয়েছে। নিয়তিবাদী জীবন দর্শন, বিজ্ঞান-মনস্কতার অভাব, কুসংস্কার, পশ্চাদপদ চিন্তা-চেতনা, অনিশ্চয়তাবোধ মানুষের মননে এমনভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে যে সমাজে প্রগতিশীল মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে না বা কিছুটা সৃষ্টি হলেও তা স্থায়ী বা টেকসই হচ্ছে না। ফলে সমগ্র সমাজ একত্রে জেগে উঠছে না। **"whole of society approach"**-বাস্তবে তেমন একটা চোখে পড়ছে না। উপরন্তু, সামাজিক অবক্ষয়, বিভেদ ও প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক সহানুভূতি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ কমে যাচ্ছে। এমনকি পারিবারিক বন্ধনও আলগা হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলেও ইতোমধ্যেই যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে জনসংখ্যার আকৃতি কিন্তু দক্ষ কর্মীর সংখ্যা তত বাড়ে নাই। দারিদ্র ও অপুষ্টি এখনও রয়ে গেছে। নারীর ক্ষমতায়ন কিছুটা হয়েছে কিন্তু নারীমুক্তি এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাদেশ এখন আর এলডিসি নয়, এটা এখন উন্নয়নশীল দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ।

এমতাবস্থায়, সত্যিকারের একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনে কি করণীয় সেটাই প্রধান বিবেচ্য। সরকার যা করছে তা প্রশংসনীয় কিন্তু আরও প্রত্যাশা রয়েছে। ব্যক্তিখাত, ব্যবসায়ী মহল, কর্পারেট-জগত তথা সুশীল সমাজ আরও কি কি করতে পারে দেশে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে সেটিই নির্ণয় করা দরকার। কিভাবে বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং "কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা নয়" সে এসডিজি-লক্ষ্যই বা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষাভিসারী হস্তক্ষেপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে কৌশল পুনর্বিন্যাস করতে পারে। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু অসাম্য দূর করার জন্য সরকার শিক্ষা তথা কারিগরি শিক্ষায়, স্বাস্থ্যসেবায় এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মকান্ডে আরও বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। সরকারের নীতি, আদর্শ, নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ- যেগুলো দরিদ্র নাগরিকদের আয়বৃদ্ধি ও মানব-সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে চিন্তিত বা কাজ করছে সেগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের সহায়-সম্পদ ও আয়ের পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার সেভাবেই দরিদ্রদের প্রস্তুত করতে পারে যাতে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল ও উচ্চতর বেতনের কর্মে নিয়োগ পায়। যদি শ্রমশক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান করা যায় তাহলে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারও স্বাস্থ্যবান হবে এবং আয়বন্টন আরও সুসংহত ও উন্নত হবে। সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমেও আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা বা আয়-বন্টনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে উঠতে সহায়তা করা এবং নিয়মানুযায়ী কাজ করার জন্য সক্ষম করে তোলা হবে মহান কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিশেষ কিছু বিষয়ে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে- অর্থ পাচার হওয়া বা আয়ের সুষম বন্টন না হয়ে ব্যাপক স্থানান্তর হয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। যেসকল ক্ষেত্রে অনিয়ম করার প্রবণতা ইতোমধ্যেই সনাক্ত হয়েছে, যেমন- সরকারি ব্যাংক-ঋণ বন্টনে ডিসক্রিশনারি ক্ষমতা, ব্যাংক-ঋণ নিয়ে ফেরৎ না দেওয়া, পুঁজিবাজারে অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ও ম্যানিপুলেশন, কর রেয়াত, সরকারি ক্রয়ে তথা সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি, বেআইনিভাবে ব্যক্তির তথা সরকারের ভূমি দখল ইত্যাদি- এসকল বিষয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই পারে প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশনসমূহ এবং ভূমি প্রশাসন ইত্যাদিকে দিয়ে ভাল কাজ করাতে। সেক্ষেত্রে, রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী দায়বদ্ধতা ও সুনির্দিষ্ট মানদন্ডে কার্যাবলী নির্বাহ হবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নির্দেশনা অনুযায়ী নয়। তাতেই আয়বন্টন ব্যবস্থা আরও সুসংহত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি সাধন আরও গতি পেতে পারে যদি ভাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিশীল কাজের পরিসর বৃদ্ধি পায়, মৌল সেবা প্রদান সম্প্রসারিত হয়, সামাজিক সুরক্ষা প্রতিবিধানসমূহ কার্যকর ও শক্তিশালী হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা আরও দক্ষতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়। আর এভাবেই সৃষ্টি হতে পারে সারাদেশে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ও মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার একটি পটভূমি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কমিশনের আইনি সহায়তায় নির্দোষ জাহালম কারাগার থেকে মুক্তি পেল

নির্দোষ হয়েও তিন বছর কারাগারে থাকেন জাহালম। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দুর্নীতির মামলায় প্রকৃত অপরাধীর পরিবর্তে জাহালমকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। হাইকোর্টের আদেশে কাশিমপুর কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। চ্যানেল ২৪ বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রচার করে এবং জাহালমের ভাই শাহানুর কমিশনে অভিযোগ দেন। কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক তাৎক্ষণিক কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন করেন এবং কমিশন উক্ত ঘটনা তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্তের আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করে দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করে। এছাড়াও কমিশন জাহালমকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় অবশেষে নির্দোষ জাহালম কারাগার থেকে মুক্তি পায়। পরবর্তীতে কমিশনের সহায়তায় সে তার চাকরিতেও যোগদান করে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যায়ভাবে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রাপ্তি

রুপালী ব্যাংক লিঃ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসাবে অবসরে গেলেও রুপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ ও গ্রাচুইটির অর্থ ৬ মাস আটক রাখে এবং ১ লক্ষ টাকা ব্যাংকের বিবিধ খাতে কর্তন করার পর অবসরত্তোর সুবিধা প্রদান করে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবর ৪ (চার) বার আপীল করেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর আপীল আবেদন বিবেচনা করতে অসম্মতি জানায়। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী প্রতিকারের ব্যবস্থাসহ ১ লক্ষ টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে অভিযোগ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রুপালী ব্যাংক লিঃ-কে কমিশনে লিখিত বক্তব্য প্রেরণের জন্য অবহিত করা হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায় যে, অভিযোগকারীর ১ লক্ষ টাকা পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে।

মিসেস সাহানা-র প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তি নিশ্চিত হল

স্কুল শিক্ষিকা মিসেস সাহানা (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে তার স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বিগত তিন বছর যাবৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করছে না, যদিও এমপিও-ভূক্তিতে তার নাম অন্তর্ভূক্ত আছে। তিনি তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবর অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সমস্যাটি নিরসনে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি।

অতপরঃ অভিযোগের সূত্র ধরে কমিশন থেকে উক্ত প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান যে তারা বিষয়টি সুরাহা করেছেন এবং মিসেস সাহানা-র নাম প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মিসেস সাহানা তার সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেন এবং কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

পিতা তার কন্যার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেল

জনাব হাসান (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান যে বিগত ১২/০৪/২০১৫ তারিখে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তিনি তার স্ত্রীর নিকট থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন। বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্তানুযায়ী মাসিক ২০০০/- টাকা ভরণ-পোষণ খরচ প্রদানপূর্বক কন্যার সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ রাখা হয়। উক্ত শর্ত মোতাবেক জনাব হাসান ৪ মাসের ভরণ-পোষণ খরচ বাবদ মোট ৮০০০/- টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন সেট তার কন্যাকে প্রদান করেন। কিন্তু তার প্রাক্তন স্ত্রী তাকে তার কন্যার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিচ্ছেন না মর্মে অভিযোগে উল্লেখ করেন। তিনি যাতে তার কন্যার সাথে দেখা করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয় কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য। তদনুযায়ী তারা নির্দিষ্ট তারিখে কমিশনে হাজির হন এবং উভয় পক্ষই মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জনাব হাসান তার প্রাক্তন স্ত্রীর নিকট থেকে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে মেয়ের ভরণ-পোষণ খরচ বাবদ টাকা পরিশোধ করা হবে এবং মেয়ের সাথে যোগাযোগের দুটি ফোন নম্বরও গ্রহণ করেন। এভাবেই বিষয়টি মিমাংসা হয়।

পুলিশের উপ-পরিদর্শককে শাস্তি দেওয়া হল

জনাব করিম (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে মিরপুর মডেল থানায় কর্মরত পুলিশের উপ-পরিদর্শক জনাব ইমরানুর হোসেন তার বাড়ী দখল করে নেওয়ার বিষয়ে হুমকি দিয়ে আসছিলেন- উক্ত উপ-পরিদর্শক জনাব করিমের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিবেন এবং তাকে ক্রস-ফায়ারে দিয়ে মেরে ফেলবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে। অতঃপর মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে প্রতিবেদন পাঠানো হয় যে উক্ত উপ-পরিদর্শকের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় মামলা রুজু করে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাকে শাস্তি প্রদান করে তার পদোন্নতি তিন বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

ছাত্রকে নির্যাতনের জন্য শিক্ষক বরখাস্ত হলেন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয় যে ওবায়দুল নামক একজন মাদ্রাসা-শিক্ষক নারায়নগঞ্জে ৫ বছর বয়সী প্রথম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রকে প্রহার করেছে। এ ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানান যে ঘটনাটি প্রমাণিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হল

মোঃ আব্দুর রহিম (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে আল-পূর্বাশা এবং এর সহযোগী কোম্পানী আল-রাব্বী ৬০ জন বাংলাদেশীকে সেইমটেক্স টেক্সটাইল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট-এ কাজ করার জন্য সুদানে প্রেরণ করে। কিন্তু তাদেরকে সন্তোষজনক বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। তারা সেইমটেক্স টেক্সটাইল-এর ম্যানেজার বরাবর বিষয়টি লিখিতভাবে জানায়। ম্যানেজার আশ্বাস প্রদান করেন যে তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং ১০ দিনের মধ্যে এর সুরাহা করবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়; উক্ত প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী বাংলাদেশী ঐ কর্মীদের আবাসস্থলে আক্রমণ চালায়, এমনকি তাদের ওপর গুলি চালানো হয় এবং অনেকেই গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত কর্মীরা বিষয়টি ঐ কোম্পানী- কর্তৃপক্ষকে এবং নিকটস্থ পুলিশ কেন্দ্রে জানায়। কিন্তু এতেও কোন সুফল মেলে না; পক্ষান্তরে তারা পুনরায় তাদের বাসার সামনেই আক্রমণের শিকার হয়। বাংলাদেশী কর্মীরা বিষয়টি পুনরায় পুলিশকে অবহিত করে কিন্তু পুলিশ সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। ঐ পরিস্থিতিতে তারা পুনরায় ম্যানেজারের নিকট গিয়ে জানায় যে, তারা সেখানে নিরাপদ বোধ করছেনা এবং যতটা শীঘ্র সম্ভব তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু ম্যানেজার তাদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে উল্টো তাদের পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহও বন্ধ করে দেয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ পেয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত করার পর প্রতিবেদনে কমিশনকে জানানো হয় যে, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানেও কোম্পানীকে বাধ্য করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মাদক বিরোধী অভিযান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা (গাইডলাইন) পাঠালো

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবরে একটি আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করে মাদক চোরাচালানি হিসাবে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনদের মানবাধিকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করার আহ্বান জানান। তিনি মাদক কারবারিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে আহ্বান জানান। উক্ত পত্রে তিনি সন্দেহভাজন মাদক কারবারিদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর মাদকবিরোধী অভিযান সম্পর্কে একটি গাইডলাইন প্রেরণ করে যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালে মেনে চলার নির্দেশনা প্রদানের জন্যও মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় শিশুদের ব্যবহার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নির্বাচনী প্রচারনায় শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট একটি আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করেন এবং আগারগাঁও-এর নির্বাচন ভবনে গিয়ে তাঁর সাথে একটি আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, বাংলাদেশে কম-বেশী প্রায় ৬ কোটি শিশু আছে। তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। দরিদ্র শিশুদের অনেকেই প্রচুর প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বড় হয়। কিন্তু বিশেষ করে যখন দেখা যায় তাদেরকে মিছিলের পুরোভাগে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তা খুবই বেদনাদায়ক। রাজনীতির নামে তাদেরকে পিকেটিং এবং অন্যান্য দূর্ধর্ষ কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে, তারা সহিংস কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন এবং নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রমের ওপর আইএলও কনভেনশন ১৮২তে বাংলাদেশ অনুসমর্থন দান করেছে, সেহেতু ঐ রীতিনীতিগুলো দেশের মানুষকে মেনে চলতে হবে। নির্বাচন কমিশন থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানায় যে, জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচনী কাজে শিশুদের যাতে ব্যবহার করা না হয় সে মর্মে নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়েছে।

ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং ড. মোবাশ্বের হাসানকে অপহরণ ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

২৮ আগষ্ট ২০১৭-তে মিডিয়ায় প্রচার হয় যে ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায় নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর পরিবার থেকে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা এ অপহরণের সাথে জড়িত। তারা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। ডঃ মোবাশ্বের হাসান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-এর নিখোঁজ হওয়ার খবর ১০ নভেম্বর ২০১৭-তে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিশন এ ঘটনার ওপর একটি সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ সকল অপহরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এ ধরণের নিখোঁজ, অপহরণ এবং জোরপূর্বক গুমের ঘটনাকে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করে। কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনাগুলোর ওপর সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর দ্রুত অনুসন্ধান প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান।

অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং মোবাশ্বের হাসানকে খুঁজে বের করার জন্য কমিশন কর্তৃক নিয়মিত চাপ-সৃষ্টির বাইরেও সুশীল সমাজ এবং মিডিয়া-ও উদ্বেগ তুলে ধরে। নিখোঁজ হওয়ার ৭৯ দিন পর অনিরুদ্ধ কুমার রায় এবং ৪৪ দিন পর মোবাশ্বের হাসান বাড়ী ফিরে আসেন; নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায়।

কমিশনের হস্তক্ষেপে ভিকটিম সুরক্ষা পেল

গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ দ্য ডেইলি স্টার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'তুচ্ছ ঘটনায় স্ত্রীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন'। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, মাগুরা সদর উপজেলার রতন কুমার শীলের স্ত্রী মালতি শীলের ছাগল প্রতিবেশির সবজি ক্ষেত নষ্ট করে ফেলে। এ ঘটনায় কিছু দুষ্কৃতকারী মালতিকে ঘর থেকে বের করে এক কিলোমিটার দূরে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে শারিরীকভাবে নির্যাতন করে।

কমিশন সুয়োমটো হিসেবে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং মাগুরা জেলার জেলা প্রশাসককে অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশ দেয়। মাগুরা থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ভিকটিম যাতে ন্যায় বিচার পায় তা নিশ্চিত করতে মাগুরার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

চা বাগানের শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিশ্চিত করল কমিশন

বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানের ২৪০০ শ্রমিককে বেতন, রেশন এবং মেডিকেল সেবা না দিয়ে দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ১৬ সপ্তাহ ধরে এ অবস্থা চলে। ভাতের মাড়, গুঁড়া চা এবং মরিচ খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতে থাকে। চা বাগানে অবস্থিত একমাত্র হাসপাতালটি ছয় মাস যাবৎ বন্ধ ছিল। চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এসব চা শ্রমিকেরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অভিযোগটি আমলে নেয়। কমিশন চা বাগানের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে, সচক্ষে ঘটনা দেখে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করে। তারা কমিশনকে জানান যে, বৈকণ্ঠপুর চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। কমিশন এ সমস্যার সমাধানের জন্য পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ-এ অভিযোগের শুনানি করে। বাগানের মালিক পক্ষ শুনানিতে অংশ নেন এবং দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য সম্মত হন। তারা লিখিতভাবে স্বাক্ষর করে অঙ্গীকার করেন যে, তারা শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও রেশন পরিশোধ করবেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা দু'সপ্তাহের বেতন পরিশোধ এবং অক্টোবর ২০১৬-এর মধ্যে বাকি বকেয়া পরিশোধের জন্য অঙ্গীকার করেন।

এছাড়া, চা বাগানের রাস্তাগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসক-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের-কে তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বারবার কমিশনের নিকট যাতে অভিযোগ করতে না হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে শ্রম অফিসের যুগ্ম পরিচালককে বলা হয়েছে। কমিশনের এ আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

পুলিশের চাকরি পেতে বৈষম্যের অবসান

নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানতে পারে যে, দলিত সম্প্রদায়ের দুজন পুলিশের সিপাহী পদের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। তারা উভয়েই মৌলভীবাজারের গাজীপুর চা বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু তাদের কোনো স্থাবর সম্পত্তি না থাকায় তাদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়নি। কমিশন মনে করে এ ঘটনায় তাদের মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার লংঘিত হয়েছে। বাংলাদেশে কাউকে নাগরিক হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হতে হবে এমনটি বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু পুলিশি তদন্তে এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। ফলে তারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হতে পারেনি। কমিশন বিষয়টি সুয়োমটো হিসেবে গ্রহণ করে মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার; পুলিশ কমিশনার, সিলেট; জ্যেষ্ঠ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে। এ চিঠির উত্তরে মৌলভীবাজার জেলার পুলিশ সুপার জানান যে, পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশক্রমে পুনরায় তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে এবং যুবক দু'জন চাকরির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। বর্তমানে তারা দু'জনই চাকুরিরত।

কমিশনের হস্তক্ষেপে ভূমিহীন ব্যক্তি তার জমি ফিরে পেল

জনাব ক জানান যে সরকারি বিধি মোতাবেক নড়াইল জেলা প্রশাসক অফিস থেকে তিনি খাস জমি বরাদ্দ পান। স্থানীয় প্রভাবশালী জনাব খ জোর পূর্বক তার এ জমিটি দখল করে নেন। জনাব ক বারবার জমিটি উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের সহায়তা চেয়ে ব্যর্থ হন। অত:পর তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশন অভিযোগটি আমলে নেয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়া নড়াইলকে জরুরি ভিত্তিতে এ অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভূমিহীনকে উক্ত জমির দখল বুঝিয়ে দেন। পরবর্তীকালে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান তিনি উক্ত জমির ভোগ দখলে আছেন। অভিযোগকারী কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

মীমাংসার হাসি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেন যা তার আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ তুলে ধরে। রাজধানী ঢাকার উত্তর কাফরুল এলাকায় ফুটপাথ ধরে হাঁটার সময় রাস্তার সাথে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনের উপর থেকে পড়া একটি ইটের আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে ডাক্তার দেখেন যে তার দৃষ্টিশক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে ডাক্তার তাকে এই আশ্বাসও দেন যে, উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু ওই চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ওই নির্মানাধীণ ভবনের মালিক এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে অভিযুক্ত হিসেবে তলব করে এবং সফলভাবে মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করতে সক্ষম হয়। দায়ী ব্যক্তিরা চিকিৎসার অধিকাংশ খরচ বহন করতে সম্মত হন। ফলে দুই পক্ষই কমিশনের কার্যালয় হতে হাসিমুখে এবং নির্ভার হয়ে বের হয়েছিলেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতায় সন্তান ফিরে পেলেন লাকি

শৈশবে ফাতেমা তুজ জোহরা লাকি প্রায়ই তার বাবা-মা'র দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি যাকে ভালোবাসতেন ২০০৮ সালে তাকে বিয়ে করে লন্ডন চলে যান। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, লাকির স্বামী ছিল খুব লোভী, শ্বশুরের সম্পত্তির লোভেই সে মূলত লাকিকে বিয়ে করে। যৌতুক এনে দেওয়ার দাবিতে এক পর্যায়ে স্বামীও লাকিকে নির্যাতন করতে থাকে। এর মধ্যে লাকি ২০১০ সালে গর্ভধারণ করলেও তার প্রতি নির্যাতন থামেনি। ২০১২ সালে লন্ডন পুলিশ তাদের আলাদা করে দেয় এবং লাকিকে মানসিক হাসপাতালে পাঠায়। দু'বছরের শিশু জুকুয়াহ লায়েক লাকিকে সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়।

২০১৫ সালে লাকি মানসিকভাবে সুস্থ হলে, তিনি তার সন্তান নিয়ে ভারতে তার এক চাচার বাসায় চলে যান। সেখান থেকে লাকির বাবা-মা তার ছেলেসহ লাকিকে যশোর নিয়ে আসেন। লাকি জানতে পারেন যে, তার স্বামী তার বাবা-মাকে টাকা দিয়েছে তাদের লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাংলাদেশে তার বাবা-মা লাকিকে বন্দী করে তার ছেলেসহ মূল্যবান কিছু জিনিসপত্র (যেমন- পাসপোর্ট ও লন্ডনের ভিসাকার্ড) নিয়ে অন্যত্র চলে যান। লাকি কৌশলে এ বন্দি দশা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে তার বাবা-মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে তিনি তার সন্তান ও মূল্যবান জিনিসপত্র ফিরে পাওয়ার দাবি জানান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তার সন্তান ও মূল্যবান জিনিসপত্র উদ্ধারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়।

কমিশন পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলে দেয় এবং লাকির সন্তানকে উদ্ধারের জন্য নির্দেশ দেন। অবশেষে লাকি তার সন্তানসহ পাসপোর্ট, ভিসাকার্ড ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ফিরে পান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপের জন্য ফাতেমা তুজ জোহরা লাকি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সাধুবাদ জানান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃঢ় পদক্ষেপের কারণেই একজন মা হিসেবে লাকি তার অধিকার ফিরে পান।

স্কুল শিক্ষকেরা তাঁদের বেতন-ভাতা পেয়েছেন

জয়নাল আবেদিন নামে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার সোনাগাজী মো. সাবের মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, ওই প্রতিষ্ঠানের ৩৪ জন শিক্ষক ও কর্মচারী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। এ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর তাদের দুর্দশা লাঘবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। এ চিঠির একটি অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরেও পাঠানো হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এ তৎপরতা সাফল্যের মুখ দেখে। মো: জয়নুল আবেদিন ২২ অক্টোবর ২০১৫ সালে কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান এবং তাতে উলেখ করেন যে, তারা তাদের দাবিকৃত বেতন-ভাতা বুঝে পেয়েছেন।

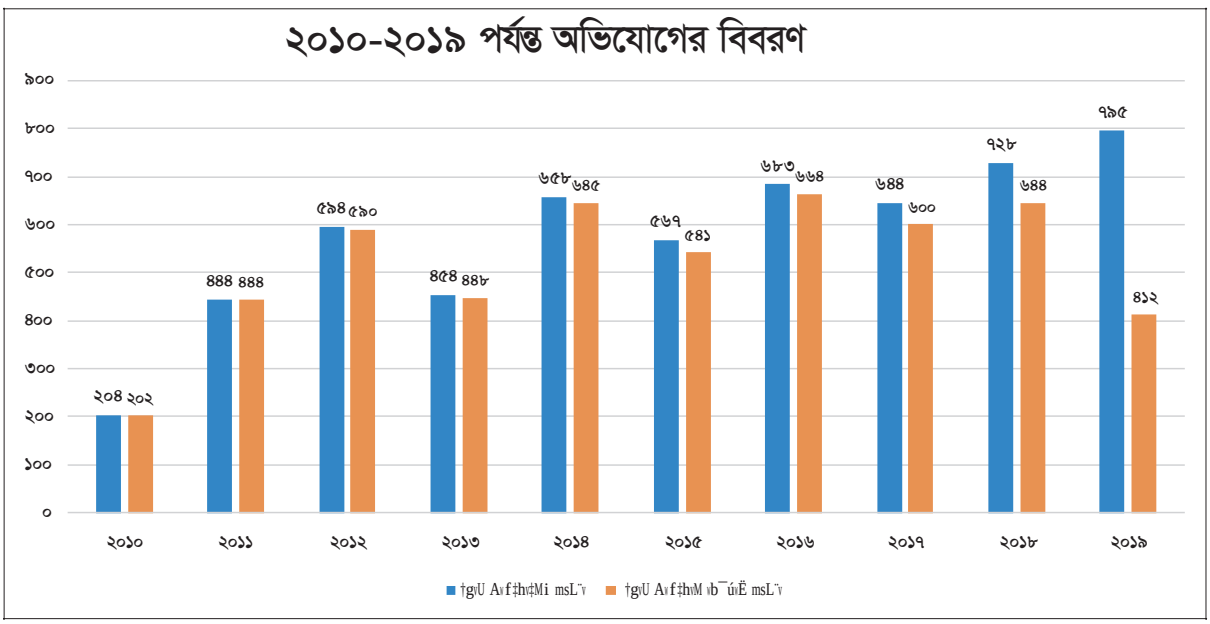

গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

"ভোলার ঘটনায় ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করা হয়েছে, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন"

bwQgv †eMg; †dmeK n¨vK K‡i weåvš—gjK †cv‡÷i mÎ a‡i †fvjvi †evinvb DwÏ‡b msNwUZ nZvn‡Zi NUbv m¤ú‡K

(mÎt Kv‡ji KÉ, 22/10/19)

"কারাগারের ধারণ ক্ষমতা না বাড়িয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত"

KvRx wiqvRj nK; RvZxq AvBbMZ mnvqZv w`em 2017- Gi Abôv‡b

(mÎt evsjv wUweDb, 27/04/17)

"জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের"

W. wgRvbi ingvb; 2015 mv‡j isc‡i AbyôZe¨ †cŠiwbevPb wel‡q

(mÎt c_g Av‡jv, 21/12/15)

বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বর্তমান কমিশন (২০১৯ - বর্তমান)

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় স্পীকারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় আইনমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে নবগঠিত কমিশনের মতবিনিময় সভা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎ প্রদান

তুরস্কের অম্বুডসম্যান ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সুরক্ষায় করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা

বিগত কমিশনসমূহ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ পেশ করছেন তৎকালীন কমিশন

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ পেশ করছেন তৎকালীন কমিশন

গাইবান্ধার গবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল পল্লী পরিদর্শন করছেন

মানবাধিকার দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী

মানবাধিকার সার্বজনীন তারুণ্য আনবে সুদিন

মানবাধিকার সুরক্ষা পেলে শান্তিপূর্ণ জীবন মেলে

মূল্যবোধের অভাবে সমাজ নষ্ট হয় আদর্শের মূল ভিত্তিটা পরিবারেই হয়

মানবাধিকারের মূলমন্ত্র সমান অধিকার সর্বত্র

মানবাধিকার সুরক্ষায় জাগছে তরুণ দল থাকবেনা আর কেউ পেছনে বাড়ছে মনের বল

মানবাধিকার রক্ষা করি ভীতিমুক্ত সমাজ গড়ি

মানবাধিকারের চর্চা করি সবাই মিলে সমাজ গড়ি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮
ই-মেইল: info@nhrc.org.bd ; ওয়েবসাইট: www.nhrc.org.bd
হেল্প লাইন : ১৬১০৮

Sweden
Sverige

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.